বাঙ্গালি ও পাত্র জনগোষ্ঠীর নৃতত্ত্বগঠনের ঐতিহাসিক পটভূমি

ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান*

সার-সংক্ষেপ ঃ *বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে ১৯৭১ সালে। দেশের ভৌগোলিক সীমারেখা ও রাজনৈতিক অধিকারের বয়স পঞ্চাশ বছরের বেশি না হলেও এর দীর্ঘদিনের ইতিহাস বিদ্যমান। খ্রিস্টপূর্ব সময়কাল থেকেই এ অঞ্চল বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়েছে। এ অঞ্চল বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষের পদস্পর্শে সিক্ত ও উন্নত হয়েছে। তাই বাংলা অঞ্চল বিভিন্ন জনধারার মানুষের সমাহার হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশে প্রায় ৫০টির মতো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী রয়েছে। এসব নৃগোষ্ঠী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করছে। এর মধ্যে রাজশাহী, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, সিলেট, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে তাদের সংখ্যা বেশি। সিলেটের ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিনির্মাণে এসব জনগোষ্ঠীর ভূমিকা অঞ্চলটিকে সাংস্কৃতিক আবহে বৈচিত্র্য এনেছে। সিলেটে বাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে পাত্র সম্প্রদায় একটি। আলোচ্য প্রবন্ধে বাঙ্গালি জনগোষ্ঠীর নৃতত্ত্বগঠনের সঙ্গে পাত্রদের নৃতত্ত্বগঠনের ঐতিহাসিক পটভূমি আলোচনার প্রয়াস রয়েছে।*

সূচক শব্দ ঃ নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, এথনোগ্রাফিক, আর্য-অনার্য, আদিবাসী, ক্ষুদ্রজাতিসত্তা, উপজাতি, অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয়চায়নিজ, প্রটো-অস্ট্রোলয়েড, বৈদিক, সংস্কৃত।

ভূমিকা

বাংলার নৃতাত্ত্বিক মিশ্রণের ইতিহাস দীর্ঘদিনের। হাজার বছরের কালের পরিক্রমায় বাঙ্গালি জাতি আজ বর্তমান অবস্থায় অবতীর্ণ হয়েছে। উল্লেখ্য যে বাঙ্গালি বলতে কেবল বর্তমানে বাংলাদেশে যে বাঙ্গালি আছে তাদেরকেই বুঝায় না; ভারতীয় উপমহাদেশের বাঙ্গালিদেরকেও এ অভিধা দ্বারা নির্দেশ করা হয়ে থাকে। বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় এত সহজ নয়। শরীফ (২০১৮) লিখেছেন,'বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় অতি জটিল। তাছাড়া এ বিষয়ে আজো পূর্ণাজ্ঞ গবেষণা হয়নি। কাজেই নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নয়' (পৃ.৪)। তবে বাংলাদেশের সমাজ-সংস্কৃতি আলোচনায় এ অঞ্চলের আদিবাসীর ভূমিকার ভিত্তিতে এ প্রবন্ধের আলোচনার পরিসর বিস্তৃত হয়েছে। সেই সঙ্গে বাঙ্গালির নৃতত্ত্বগঠনের ইতিহাসের সঙ্গে সিলেটের নিঃস্ব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পাত্রদের নৃতত্ত্বগঠনের ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণাকর্মের মাধ্যমে বাঙ্গালির নৃতত্ত্বগঠনের সঙ্গে পাত্র সংস্কৃতির নৃতত্ত্বগঠনের ঐতিহাসিক উৎস অনুসন্ধানের প্রয়াস রয়েছে।

গবেষণার যৌক্তিকতা

বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখা ১৯৭১ সালে নির্ধারিত হলেও বাংলা অঞ্চলের ইতিহাস আরও অনেক আগে। বিভিন্ন জনধারার মানুষ এখানে এসেছে এবং এখানে বাস করেছে। বাংলাাদেশে বহু সংস্কৃতির মানুষের বাস দেশটিকে একটি সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের এই সংস্কৃতি বিশ্লেষণ করতে হলে এর নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস অন্বেষণ আবশ্যক। অন্যদিকে, সিলেটের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পাত্রদের ইতিহাস জানতে হলে বাংলাদেশের মানুষের নৃতত্ত্বগঠনের সাথে তাদের সম্পর্ক ও বৈসম্পর্কের বিষয়টিও অবগত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এ বিষয়ে আজো অবধি কোন গবেষণা হয়নি। কাজেই এ বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার যৌক্তিকতা রয়েছে।

---

* *অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য গবেষণাটি এথনোগ্রাফিক গবেষণা। এই গবেষণায় তাই গুণগত পদ্ধতির (Qualitative method) আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল

গবেষণাকর্মটিতে দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে এ বিষয়ে প্রকাশিত বই, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও নিবন্ধ বেছে নেয়া হয়েছে।

বাঙ্গালির নৃতত্ত্ব গঠনের ইতিহাস

বাঙ্গালির অতি নিকট ইতিহাস অন্বেষণে আর্যদের এ উপমহাদেশে আগমনের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়ে থাকে সর্বাগ্রে। আর্য-অনার্য, আদিবাসী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, ক্ষুদ্রজাতিসত্তা, স্বদেশীয় অধিবাসী প্রভৃতি বাঙ্গালির নৃতাত্ত্বিক গঠনের ক্ষেত্রে অনিবার্য প্রত্যয় হিসেবে বিবেচিত। সাধারণত এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বা অপ্রধান ধারাসমূহ বর্তমানে বিভিন্ন নামে অভিহিত; যেমন, আদিবাসী (Aboriginal/ Indegenous peoples), আদিম (primitve), উপজাতি (Tribe/ Clan), ক্ষুদ্র জাতি বা জাতিসত্তা (Minor Group), নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী (Ethnic people), লঘু নৃগোষ্ঠী (Minor Ethnic Group), অনুন্নত জাতি বা অনুন্নত জনগোষ্ঠী (Under developed people), জনজাতি গোষ্ঠী প্রভৃতি (মন্তাজ, ২০১৪)। স্পষ্টতই প্রতিভাত যে, বাঙ্গালির নৃতাত্ত্বিক গঠনের ক্ষেত্রে আর্যদের আগমন একটি বড় অধ্যায় হিসেবে স্বীকৃত। কাজেই আর্যদের আগমনের ইতিহাসের সঙ্গে এ অঞ্চলের নৃগোষ্ঠীর আদিমতম ইতিহাস যেমন সংশ্লিষ্ট তেমনি বাঙ্গালির নৃতত্ত্ব গঠনে তাদের ভূমিকাও গ্রহণীয়।

নৃতাত্ত্বিক যুগবিচারে পাক ভারত উপমহাদেশে হিমযুগের পর থেকে অর্থাৎ প্রায় দশ হাজার বছর পূর্বে মানুষের বসবাস ছিল বলে অনুমান করা হয়। তবে এ বিষয়ে তেমন তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে তা গুরুত্বসহ বিবেচিত হয়নি। কিন্তু প্রত্নপ্রস্তর যুগ বা পুরা প্রস্তরযুগ থেকে উপমহাদেশের প্রায় সর্বত্রই এ বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া গেছে। বাংলাদেশের প্রত্ন-প্রস্তর যুগের যে-কয়টি পাথুরে হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে তার প্রায় সবকটিই পাওয়া গেছে বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে ও পার্বত্য চট্টগ্রামে। আবিষ্কৃত অস্ত্র দেখতে প্রত্ন-প্রস্তর যুগের হলেও আদতে তা আরও পরবর্তী যুগের। প্রত্ন-প্রস্তর যুগ থেকেই উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতোই বাংলাদেশেও যে মানুষের বসবাস শুরু হয়েছিল সে সম্পর্কে বেশিরভাগই একমত পোষণ করেছেন (মন্তাজ, ২০১৪)। প্রাক-ঐতিহাসিক যুগে ভারতীয় উপমহাদেশে আফ্রিকা থেকে আরব উপদ্বীপ হয়ে পারস্যের উপকূল বেয়ে প্রথমে আসে নেগ্রিটোবটু। তাদের পরে আসে আদি অস্ট্রেলীয় বা অস্ট্রিকরা। মধ্যমাকৃতির লম্বামাথার এই জনগোষ্ঠী পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে প্রত্ন-প্রস্তর যুগের জীবন-রীতি ও সংস্কৃতি নিয়ে। অনেক মনে করেন যে, অস্ট্রিক কোন জনগোষ্ঠীর নাম নয়, এটি ভাষাগোষ্ঠীর নাম। উপমহাদেশে কোল, মুণ্ডা ও নিকোবর দ্বীপের ভাষা এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত। অস্ট্রিকদের পরে আসে দ্রাবিড় ভাষী লোকেরা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে। এর পরে এই উপমহাদেশে আগমন করে আর্যরা। আর্যদের পরে আসে মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠী।

আর্যরা ঠিক কবে এ দেশে এসেছে তার বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পাওয়া যায় না। তবে অনুমান করা হয়, আর্যরা ভারতে প্রবেশ করেছে দুই হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে। বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের প্রভাব প্রতিফলিত হতে সময় লেগেছে আরও প্রায় এক হাজার বছর। আর্য প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছে বা পরিপুষ্ট হয়েছে অনেক স্থানীয় ভাষা। সেক্ষেত্রে বাংলা ভাষার অবস্থান কোথায়? এ নিয়ে বিভিন্ন বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিকগণ নিশ্চিত হয়েছেন যে, আর্যদের বাংলায় আগমনের আগেও এ দেশবাসীর এক ধরনের ভাষা ছিল। হোসেন (২০১৩) এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

> আর্য অধিকারের পর এসব জনপদের সভ্যতাকে অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি। আত্মীয়তার সূত্রে বঙ্গ-পুণ্ড্র প্রভৃতি জনপদকে স্বীকার করেছে তারা। মহাভারতের প্রাচীন উপাখ্যানের অনুরূপ গল্পকথা স্থান পেয়েছে হরিবংশের ৩১ অধ্যায়ে। বলা হয়েছেঃ দৈতরাজ বলিরাজ পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে ও দীর্ঘতমা ঋষির ঔরষে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুক্ষ নামে পঞ্চপুত্র গ্রহণ করেছিল এবং তাদের নামানুসারে পরবর্তীকালে অঙ্গদেশ, বঙ্গদেশ, পুণ্ড্রদেশ, সুক্ষদেশ ও কলিঙ্গদেশ- এই পাঁচটি রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি, দেশজ মনসা-চণ্ডীকে কীভাবে শিবের আত্মীয় করে পুরাণে স্থান দেয়া হয়েছিল। উমেশচন্দ্র বটবেল দীর্ঘতমা ঋষি খ্রি. পূ. ১৬৯০ অব্দে বর্তমান ছিলেন বলে সিদ্ধান্ত করেছেন (পৃ. ২৮)।

বাংলা ভাষা অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষার সংমিশ্রণে সৃষ্ট। এসব অন্বেষণে নৃতাত্ত্বিক বিষয়ও সংশ্লিষ্ট হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়েছে বাঙ্গালি জাতি উত্তর ভারতের জাতিসমূহ থেকে একেবারেই আলাদা (শাহনাওয়াজ, ২০০৭)। বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় উদঘাটন করতে গিয়ে পণ্ডিতগণ ঐতিহাসিক যুগে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ জনধারার উল্লেখ করেছেন। এ তিনটি ধারা হচ্ছে-'(ক) মঙ্গোলীয়চায়নিজ প্রবাহ, (খ) প্রটো-অস্ট্রোলয়েড বা ডেভিডড বা অস্ট্রিক জনধারা এবং (গ) দ্রাবিড় ভাষাভাষী বা ভূমধ্যীয় বা মেডিটেরেনিয়ান নৃজাতি রূপের প্রবাহ। পরে আরো ইন্দো-আর্য বা উত্তর ইন্ডিড বা ইন্দো- ভূমধ্য বা দক্ষিণ ইউরোপীয় নৃজাতিরূপ এখানে মিশ্রণ ঘটায় (আলম, ২০০৭: ২০)। সুর এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'বাঙলার আদিম অধিবাসীরা ছিল প্রাক-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোক। নৃতত্ত্বের ভাষায় তাদের বলা হয় আদি-অস্ত্রাল। আদি অস্ত্রাল বলবার উদ্দেশ্য হচ্ছে, অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের দৈহিক গঠনের মিল আছে' (সুর, ১৯৭৭: ২৩)। প্রসঙ্গে নিচের উক্তিটিও স্মর্তব্য-

> প্রাচীন সাহিত্যে এদেরকে নিষাদ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বাংলার আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল, লোধা প্রভৃতি উপজাতিসমূহ এই গোষ্ঠীর লোক। এছাড়া, হিন্দু সমাজের তথাকথিত 'অন্ত্যজ' জাতিসমূহও এই গোষ্ঠীরই বংশধর। বাঙলায় প্রথম অনুপ্রবেশ করে দ্রাবিড়রা। এরা দ্রাবিড় ভাষার লোক ছিল। বৈদিক সাহিত্যে এদের 'দস্যু' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এদের অনুসরণে আসে আর্য ভাষাভাষী আলপীয়রা (Alpinoids)। মনে হয়, এদের একদল এশিয়া মাইনর বা বেলুচিস্তান থেকে পশ্চিম সাগরের উপকূল ধরে অগ্রসর হয়ে ক্রমশ সিন্ধু, কাথিয়াবাড়, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কুর্গ, কন্নাদ ও তামিলনাড়ু প্রদেশে পৌঁছায় এবং তাদেরই আরেকদল আরও অগ্রসর হয়ে পূর্ব উপকূল হয়ে বাংলা ও ওড়িশায় আসে। এরাই মনে হয়, বৈদিক ও দেবোত্তর সাহিত্যে বর্ণিত 'অসুর' জাতি। আরও মনে হয়, এদের সকলেরই সামাজিক সংগঠন কৌমভিত্তিক (tribes) ছিল এবং এই সকল কৌমগোষ্ঠীর (tribal) নামেই পরে এক একটা জনপদের সৃষ্টি হয় (সুর, ২০০৮:২১)।

বৈদিক ও পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যে অসুর নামে একটি জাতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। কেউ কেউ মনে করেন, আর্য-পূর্ব যুগের স্থানীয় অধিবাসীরাই এই অসুর। ভিন্ন মতাবলম্বীদের মতে, আর্যদের এক ভিন্ন ধারার গোত্রের নাম 'অসুর'। তবে অসুরদের উৎস যাই হোক না কেন, যোদ্ধা আর্যদের প্রবেশের অনেক আগেই এ দেশে তারা বসতি নির্মাণে সমর্থ হয়েছিল। কৃষি ও গো-পালনের মধ্য দিয়ে একটি উন্নত সভ্যতা গড়ে তোলে তারা কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল। এ প্রসঙ্গে শাহনাওয়াজ (২০০৭) বলেছেন,

> হরিবংশ' নামের এক প্রাচীন সিংহলী গ্রন্থের কাহিনীতেও এই সত্যের আভাষ রয়েছে। বলা হয়েছে, পুরুবংশে বলি নামে এক রাজা ছিলেন। এই রাজার ছিল পাঁচ পুত্র। তাঁদের নাম 'অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুক্ষ ও পুণ্ড্র। এঁরা পাঁচটি রাজ্যে শাসন করতেন। তাঁদের নাম থেকেই যে জনবসতি ছিল তা আর্যগ্রন্থে থেকেও জানা যায়' (পৃ. ১৯)।

দ্রাবিড় জাতি ভারতের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। কেউ কেউ এ জাতিকে ভারতে আর্য-পূর্ব জাতিসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গোত্র হিসেবে বিবেচনা করতে চান; যদিও তাদের আদি ভূমি বিষয়ে কোন নিঃসংশয় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুষ্কর। কেউ কেউ মনে করেন, দ্রাবিড়রা কোল ও ভিলদের মতো পুরোপুলীয় যুগে ভারতীয় আদিবাসীদের গোত্রভুক্ত ছিল। তবে কোল ও ভিলদের চেয়ে দ্রাবিড়রা ছিল অনেক বেশি বুদ্ধিসম্পন্ন ও অগ্রসর জাতি। দ্রাবিড়দের জাতিগোষ্ঠী দক্ষিণে ইন্দো-আফ্রিকার পথ ধরে ভারতে এসেছে। দ্রাবিড়দের এই আগমনের ইতিহাস সত্যিই এক ধুম্রছায়ায় আবদ্ধ। গবেষকগণ বিবেচনা করেছেন এরা আফ্রিকার নিগ্রোদের গোত্রভুক্ত। তবে সকলেই এই মত মেনে নেননি। কেউ কেউ সিদ্ধান্তে এসেছেন- সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কারের পর এখানে যে আদিবাসীদের কথা জানা যায় তারাই দ্রাবিড় (শাহনাওয়াজ, ২০০৭)। দ্রাবিড়রা অতিপ্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় অঞ্চলে বসবাস করে আসছে বলে অনেকে তাই অভিমত দিয়েছেন। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেই ভারতে দ্রাবিড়দের অবস্থান ছিল বলে অনুমান করা হয়। এক সময় দ্রাবিড় জাতি সমগ্র উত্তর ভারতব্যাপী নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। বর্তমান দক্ষিণ ভারতের কোন কোন অঞ্চলে এদের সন্ধান পাওয়া যায়। ভারতের উত্তর প্রদেশ ও বাংলাদেশের কোন কোন উপজাতীয় গোষ্ঠীর দেহবিন্যাসে দ্রাবিড় রক্তের চিহ্ন রয়েছে বলে অনুমান করা হয় (শাহনাওয়াজ)। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, 'সর্বপ্রথম নেগ্রিটো, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় এবং এদের পরে আর্য এবং পরে ভোট চীনাদের অনুপ্রবেশ বাংলায় ঘটেছে। দ্রাবিড় এবং আর্যদের আগমনের অনেক পূর্ব কেই এখানে অস্ট্রিকদের বসতি ছিল বলে পণ্ডিতদের অনুমান (উল্লেখ, আলম,২০০৭ :২০)। অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, আর্যদের সংমিশ্রণে বাংলার নৃতাত্ত্বিক বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে। নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু সর্বপ্রথম বাংলায় এসেছে বলে ধারণা করা হয়। বাংলার আদিবাসীন্দা হিসেবে তাদের কথাই বেশি আলোচিত হয়েছে। অনুমান করা হয় এরপর বাংলায় আসে প্রটো-অস্ট্রোলয়েড বা ভেড্ডিড বা অস্ট্রিক। এরপর আরো তিনটি জনগোষ্ঠী বাংলায় এসেছে। এরা লম্বা, গোলমুণ্ড বা এ্যালপাইন নরগোষ্ঠী এবং আদি নর্ডিক জন। 'সাধারণত আর্য ভাষাভাষীদেরকে দু'নরগোষ্ঠীতে দেখানো হয়ে থাকে। একটি আলপীয় এবং অন্যটি নর্ডিক। আলপীয়রা সম্ভবত এশিয়া মাইনর বা বেলুচিস্তান থেকে এবং নর্ডিকরা উত্তর এশিয়া থেকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বাংলায় আসে (আলম, ২০০৭: ২১)। আগমনের ইতিহাস ও বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে মতানৈক্য থাকলেও ভারতীয় অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ও নৃতত্ত্ব গঠনে দ্রাবিড়দের ভূমিকা অনিবার্য প্রত্যয় হিসেবেই আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়েছে।

এরপর বাংলায় আগমন করে মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠী। ব্রহ্মপুত্র নদের উপত্যাকা ধরে, বার্মা থেকে তারা বাংলায় এসেছিল বলে অনুমিত। 'এরা সম্ভবত বাংলার উত্তর অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এ কারণেই হয়ত বা রংপুর, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলের মধ্যেই তাদের প্রভাব সীমাবদ্ধ' (আলম, ২০০৭ :২০)। ইতিহাসের আদি থেকে ভারতীয় উপমহাদেশের জাতিসত্তার খোঁজ নিলে জানা যায় সিন্ধু নদের তীরে এ উপমহাদেশের প্রথম সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। 'প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে গড়ে উঠেছিল হরপ্পা আর মহেঞ্জোদারো অঞ্চলসহ আজকের ভারত ও পাকিস্তানের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এক উন্নত নগর সভ্যতা। সিন্ধু সভ্যতা নামে যার সাধারণ পরিচিতি। সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীদের সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পাওয়া যায় না। কোন কোন গবেষক মনে করেন, 'চার ধরনের মানুষের বাস ছিল এখানে। এরা হচ্ছেন- আর্য, তুরানীয়, সেমীয় এবং হামীয়। এদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল আর্য ও সেমীয়রা। এই সেমীয়রাই 'অসুর বা 'অসররা' নামে পরিচিত (শাহনাওয়াজ,২০০৭: ২৪)। অবশ্য এই ধারণায় যাঁরা পৌঁছেছেন তাঁরা মনে করেন আর্যরা বহিরাগত নন,ভারতই হচ্ছে তাদের উৎস। সিন্ধুসভ্যতার সময়কাল থেকে প্রাচীন যুগের পরবর্তী ধারায় যেসব জাতির মিশ্রণ ঘটেছে এই উপমহাদেশে তাদেরকে বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় পণ্ডিতগণ বিভক্ত করেছেন-

আদিম উপজাতিসমূহ, মঙ্গোলীয়, দ্রাবিড় এবং আর্য। 'উপমহাদেশের বিভিন্ন জনাকীর্ণ অঞ্চলে আদিম উপজাতির বাস। এরা কোল, ভিল, গন্ড ও সাঁলতাল নামে পরিচিত। আকারে এরা বেঁটে-খাটো, নাক থেবড়া, ঘন চুল ও গাঁয়ের রং কালো। -- এরা কখনও সভ্য জাতির মর্যাদা পায়নি। কোন কোন পণ্ডিতের মতে এই উপজাতিসমূহই ভারতের আদিমতম মানবগোষ্ঠীর সদস্য (শাহনাওয়াজ, ২০০৭: ২৪)।

মঙ্গোলীয়রা আকারে বেঁটে, দেহ সুগঠিত, শক্ত চিবুক, দাড়ি-গোঁফ কম, মুখাকৃতি গোলাকার এবং গায়ের রং হলদেটে। তিব্বতীয়, চীনা, জাপানি এবং বর্মিদের সমগোত্রীয় এরা। তিব্বত এবং মঙ্গোলিয়া হচ্ছে তাদের আদিভূমি। ভারতে প্রবেশের পর তারা আর্যদের সঙ্গে মিশে যায়। এই গোষ্ঠীর অধিবাসীদের আঞ্চলিক বিভাজনও লক্ষণীয়। হিমালয়ের পাদদেশে সিকিম, আলমোরা, গারহবাল, ভুটান প্রভৃতি অঞ্চলে তারা আবাস গড়েছে। প্রাচীনকাল থেকে এদের বংশধররা বাংলাদেশে সুদৃঢ় অবস্থান তৈরি করেছিল। ময়মনসিংহ অঞ্চলে গারো, হাজং, চট্টগ্রাম, পার্বত্য-চট্টগ্রাম অঞ্চলে চাকমা,মারমা, ত্রিপুরা প্রমুখ; সিলেট অঞ্চলে মণিপুরী, খাসিয়া, পটুয়াখালীতে রাখাইন-মারমা; উত্তর বাংলায় সাঁওতাল- প্রভৃতি অঞ্চলে তাদের আবাস সহজেই দৃশ্যমান।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, আদি-অষ্ট্রাল, দ্রাবিড় ও আলপীয় নরগোষ্ঠীর লোকদের সংমিশ্রণেই বাঙলার নৃতাত্ত্বিক বুনিয়াদ গঠিত হয়েছে। প্রথমে তাদের ভাষা ছিল ভিন্ন। আদি-অস্ট্রালরা যে ভাষায় কথা বলত তাকে বলা হয় অস্ট্রিক' ভাষার শাখা মুণ্ডারী ভাষা। এই অস্ট্রিক-মুণ্ডারী ভাষাই বাংলা ভাষার ভিত্তি স্থাপন করে। কেননা বাংলাভাষায় এই ভাষা থেকে অনেক শব্দ গ্রহণ করেছে। ভারতীয় উপমহাদেশে এই ভাষীর লোক এখনও রয়েছে। 'বর্তমানে ভারতে এই ভাষায় কথা বলে সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোরওয়া, জুয়াঙ, শবর প্রভৃতি উপজাতিসমূহ। অস্ট্রিক-মুণ্ডারী ভাষাভাষী জাতিসমূহের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'কুড়ি' (২০) সংখ্যাকে ভিত্তি করে উচ্চতর সংখ্যায় প্রকাশ করা' (সুর, ১৯৯২: ২১)।

ভারতে আর্য-পূর্ব জাতিসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গোত্র হচ্ছে দ্রাবিড়। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেই ভারতে দ্রাবিড়দের অবস্থান ছিল বলে অনুমান করা হয়। এক সময় দ্রাবিড় জাতি সমগ্র উত্তর ভারতব্যাপী নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। বর্তমানেও ভারতে তাদের আবাস রয়েছে। ভারতের উত্তর প্রদেশ ও বাংলাদেশের কোন কোন উপজাতীয় গোষ্ঠীর দেহবিন্যাসে দ্রাবিড় রক্তের চিহ্ন রয়েছে বলে মনে করা হয় । দ্রাবিড়রা ছিল শান্তিপ্রিয়। তারা যুদ্ধংদেহী জাতি আর্যদেরকে প্রতিরোধে সক্ষম হয়নি। বাধ্য হয়েই তারা পিছু হটতে থাকে। এভাবে তারা দাক্ষিণাত্য ও ভারতের সর্ব দক্ষিণে সরে যায়। এই অঞ্চলগুলোতে দ্রাবিড় সংস্কৃতি অনেককাল টিকে থাকে। 'সময়ের বিবর্তন হয়। এক সময় আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে মিশ্রণ ঘটে দ্রাবিড় সংস্কৃতির (শাহনাওয়াজ,২০০৭:২৫-২৬)। অনুরূপভাবে বাংলা ভাষায় দ্রাবিড় ভাষারও অনেক শব্দ আছে। 'দ্রাবিড় ভাষাভাষী লোকেরা কোন এক সময় পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে ছিল, তা ওড়িশার কুই বা কন্ট, পারজি ও ওল্লার, বিহারের কুরুখ ও ওঁরাও, রাজমহল পাহাড়ের মালতো ও মধ্যপ্রদেশের কোলামি জাতিসমূহের ভাষা থেকে বুঝতে পারা যায়। এগুলি সবই দ্রাবিড় জাতির ভাষা থেকে উদ্ভূত' (সুর, ১৯৯২:২১)।

বাঙ্গালি মঙ্গোলীয় জাতি নয়, দ্রাবিড় জাতির সঙ্গেও তাদের খুব বেশী রক্ত-সম্বন্ধ নেই। রিজলির সময়ে দ্রাবিড় জাতিগণকেই ভারতের আদিম অধিবাসী বলে মনে করা হত। এবং সে জন্যই তিনি বাঙালির নৃতাত্ত্বিক গঠনে দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণ আছে-এরূপ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। 'কিন্তু পরবর্তীকালে প্রমাণ হয়েছে যে আর্য-ভাষিগণের ন্যায় দ্রাবিড় জাতিগণও ভারতে আগন্তক মাত্র। তাদের পূর্বে ভারতে প্রাক-দ্রাবিড় (pre-Dravidians) বা আদি অস্ত্রাল (Proto-Australoid) জাতিসমূহ বাস করত এবং তারাই

ভারতের আদিম অধিবাসী (সুর, ১৯৭৭:২২)। হক'মোটামুটিভাবে বলা চলে নেগ্রিটো-অস্ট্রেলীয় (ভেড্ডিড) ও মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীরই মিশ্রণ ঘটেছে বেশি। তাই শতকরা ষাট ভাগ অস্ট্রেলীয়, বিশ ভাগ মঙ্গোলীয়, পনেরো ভাগ নেগ্রিটো এবং পাঁচ ভাগ অন্য নানা নরগোষ্ঠীর রক্ত মিশেছে বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয় (শরীফ,২০০১:২০)।

বাংলার জাতি গঠনে এই যে বিভিন্ন জাতির মিশ্রণ তাতে ঐতিহাসিক কারণ যেমন বিদ্যমান তেমনি আছে ভৌগোলিক অনিবার্যতা। জাতিবর্ণের এই বিশাল ধারা রূপান্তরিত কাঠামোতে বাংলায়ও ছড়িয়ে পড়ে। শাহনাওয়াজ (২০০৭) এর অন্বেষা এখানে প্রণিধানযোগ্য-

> প্রাচীন জনগোষ্ঠীর এই যে মিলন মেলা বাংলায় তার মধ্য থেকে ‘প্রাচীনতম হিসেবে ‘বঙ্গদ’-এর নাম করা যেতে পারে। ঋগবেদে প্রথম এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের ‘অসুর’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বৌদ্ধ গ্রন্থ ‘মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে’ আর্য ভাষাকে বলা হয়েছে ‘অসুর’ ভাষা। গবেষকগণ ‘বঙ্গদ’ শব্দের ধাতুগত অর্থ খোঁজার চেষ্টা করেছেন। ‘বঙ্গ’ এর পর ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষার ধাতু ‘রেইদ’ (Reid) যোগ করা হয়েছে। তাতে অর্থ দাঁড়ায় অবলম্বন করা বা পোষণ করা (পৃ. ২৬)।

‘বঙ্গ’ বা ‘বোঙ্গা’কে বোঝায় এক ধরনের শক্তি আর ‘বঙ্গদ’ হলো বঙ+ঋদ অর্থাৎ শক্তিতে সমৃদ্ধ। এই বঙ্গদ থেকেই ক্রমে ‘গঙারিডি’ শব্দের উদ্ভব হয়েছে। ‘গ্রিক সূত্রে গঙারিডি বলে প্রাচীন বাংলার শক্তিশালী রাজ্যের কথা উল্লিখিত হয়েছে। ‘গ্রিক লেখনি থেকে আলেকজান্ডার ‘গঙারিডি’ রাজ্যের খোঁজ পেয়েছিলেন। সেখানে প্রতিষ্ঠিত ছিল বাঙালির এক শক্তিশালী রাজ্য। গ্রিক লেখনির হিসেব থেকে অনুমান করা চলে খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দে গঙারিডি নামের রাজ্যটির অস্তিত্ব ছিল (শাহনাওয়াজ,২০০৭: ২৬)। শরীফের (২০০৪) উক্তিটি এখানে প্রণিধানযোগ্য-

> মোটামুটিভাবে আলেক্সান্ডর ভারত অভিযান কালে (৩২৬ খ্রি.পূ.) গঙ্গাহৃদয় বা গঙ্গাহৃদ নামে গাঙ্গেয় বাঙলায় একটা রাজ্য ও প্রবল রাজ্যশক্তি ছিল বলে গ্রীক সূত্রে সংবাদ মেলে। এই সময়কার বাঙলারাজের নৌশক্তি গজাশক্তি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। হয়তো পাটলীপুত্রের রাজারা তথা নন্দ- মৌর্য-সুঙ্গ-কম্ব বংশীয় রাঢ়-সুক্ষ্ম-পুণ্ড্র শাসন করেছেন ৩১৯ খ্রিস্টাব্দ অবধি। ৩২০ থেকে ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ অবধি গুপ্ত শাসনে ছিল বাঙলার বহু অঞ্চল। সমুদ্রগুপ্তের সময় থেকে বাঙলার শাসন দৃঢ় ও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে (পৃ.২২)।

এখানকার মৌলিক অধিবাসীদের নাম থেকে দেশটির নাম হয়েছে। এ কারণে বাংলা নামের দেশটিকে এক সময় ‘গণ্ড’দের দেশ বলা হতো। পরবর্তী সময়ে গণ্ড থেকে হয়েছে ‘গৌড়’ আর বঙ্গদ থেকে হয়েছে বঙ্গল ও বাঙাল। একইভাবে এ অঞ্চলের শাসকদের বলা হতো বঙ্গেশর বা গৌড়েশ্বর। এই গণ্ড বা বঙ্গদ’রা যে বাংলার নিরবচ্ছিন্ন জাতিগোষ্ঠী নয়, অনেক জাতির মিলন ধারার মধ্য থেকেই গড়ে উঠেছে তা আজ প্রমাণিত। সিন্ধু সভ্যতার যুগে দেব ও অসুররা পাশাপাশি শান্তিপূর্ণভাবে বাস করতো। বৈদিক সাহিত্যে তাদের ভাইয়ের মতো বলা হয়েছে। পরে ভূগু অগ্নিপূজার প্রবর্তন করেন। এই পূজায় অসুররা যোগ দেয়নি। এ সময় থেকে দেব ও অসুরের মধ্যে সংঘাত শুরু হয়। যারা সুর পান করতেন তারা হলেন সুর আর যার সুর পানকে ঘৃণা করতেন তারা হলেন অসুর। কোন কোন সূত্র মতে এরা উভয়েই আর্য ধারা থেকে উদ্ভূত। প্রায় তিন হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকেই এই দুই ধারার মধ্যে সংঘাত শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত পরাজয় ঘটে অসুরদের। এরা স্বদেশ ছেড়ে ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন রাজ্যে। মহাভারতের সূত্র থেকে জানা যায় অসুরদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন দিবোদাসের পূত্র সুদাস। সুদাসের জন্ম হয়েছিল ভরত বংশে। তাঁর

নাম থেকেই ভারত নামটি সৃষ্টি হয়েছে। এই ভরতরা পরে বিভক্ত হয়ে যায় কুরু-পাঞ্চাল ও কৌরব-পাণ্ডবে এবং পরে গৌড়-দ্রাবিড়ে। আগেই বলা হয়েছে গৌড়রাই প্রাচীনকালে গণ্ড নামে পরিচিত ছিল। টলেমির বর্ণনায়ও গণ্ডদের কথা জানা যায়।

এরপর এই মিলন মেলায় নানা জাতির অবস্থানকে সহজেই নির্ণয় করা যায়। মৌর্য শাসনযুগেই (খ্রিস্টপূর্ব তিন শতক) বাংলা মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়। এ সময় থেকে বাংলায় বহিরাগত ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের আগমন ঘটতে থাকে। চতুর্থ খ্রিস্টাব্দ থেকে ভারতে গুপ্তদের উত্থান ও বিকাশ ঘটে। গুপ্ত বংশ এসময় থেকেই পরাক্রমশালী হয়ে ওঠে। এ পর্বে বাংলাও গুপ্তবংশের প্রদেশে পরিণত হয়। ফলে ভারতীয় জাতিগোষ্ঠীর অভিবাসনের ধারা এ পর্বেও অব্যাহত থাকে। আট শতকে পাল শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলায় নিরবচ্ছিন্নভাবে বাঙালির সার্বভৌম শাসন শুরু হয়। এর আগে অবশ্য স্বাধীন বঙ্গ রাজ্য ও স্বাধীন গৌড় রাজ্য স্থানীয় কাঠামো গড়ে তুলেছিল। এরপর পরের অধ্যায়ের সূচনা ঘটে। পালরাজাদের আগমন বাংলার সাংস্কৃতিক আবহে অন্তর্ভূক্ত হয় নবতর এক ধারা। বিভিন্ন স্তরের সমবায়ে গঠিত পালদের অবস্থান এ অঞ্চলে সদৃঢ় হয়। ‘বাংলার জাতিবিন্যাসের দিক থেকে পালরাজারা লাট, ভাট, চাট, কর্ণাট এমন নানা জাতের বহিরঙ্গীয় সেনাপুরুষদের আমদানী করেছিলেন। পরে এরা সামন্তভূস্বামী হিসেবে বাংলায় স্থায়ী আবাস গড়ে তোলেন। এদেরই এক গোষ্ঠী দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট থেকে আসা সেনরা বাংলার রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে নেয় (শাহনাওয়াজ,২০০৭)। এগার শতক থেকে প্রতিষ্ঠিত সেন রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় ব্রাহ্মণ্যবাদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাদেরই ছত্রছায়ায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,বৈশ্য, শূদ্র-এভাবে চতুবর্ণে বিভাজিত হয়ে যায় সমাজ। বাাংলায় নানা জাতির আগমন ধারার চূড়ান্ত ধাপ মধ্যযুগ। তের শতক থেকে বাংলার ক্ষমতা দখল করে মুসলমান তুর্কিরা। তুর্কি মুসলমানরা অধিকর্তা হয়ে যান বাংলার। এই যোদ্ধা মুসলমানদের পাশাপাশি পারস্য, সমরখন্দ, বুখারা, আফগানিস্তান থেকে আসেন সুফি-সাধকগণ। স্থানীয় মানুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে শুরু করেন। ফলে বাংলার জাতিবর্ণে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈনের সামবায়িক মিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। পনের শতকের মাঝামাঝি বাংলার মুসলিম সুলতান বারবক শাহ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য আফ্রিকা থেকে হাবসি ক্রীতদাস আমদানি করেন। একসময় হাবশিরা ক্ষমতাশালী হয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাও চলে যায় এদের হাতে। এভাবে বাংলার জাতিবিন্যাসে নিগ্রোদের রক্তধারার হাবশিদের অবস্থানকে মেনে নিতে হয়। বাংলার স্বাধীন সার্বভৌম সুলতানি শাসনের সমাপ্তি ঘটে ষোল শতকের শেষ পর্বে। এর পর প্রথমে আফগান ও পরে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে বাংলা দিল্লীর অধীনে একটি সুবায় পরিণত হয়। মোগল যুগে শেখ, পাঠানসহ ইরানি-আফগানি জাতিগোষ্ঠীর আগমন ও বসতি গড়ে উঠতে থাকে বাংলায় (শাহনাওয়াজ, ২০০৭)।

বাংলার এই ইতিহাসের সঙ্গে বাংলাভাষার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। কারণ বাংলা শব্দের উৎপত্তি নিয়ে ভাষাবিজ্ঞানী, ইতিহাসবিদ ও নৃবিজ্ঞানীগণ প্রাচীন ঐতিহ্যকেই পাথেয় বলে মনে করেছেন। প্রায় পাঁচ হাজার বছর থেকেই এই বঙ্গ শব্দের প্রচলন ছিল। ‘ঐতরেয় আরণ্যক’ গ্রন্থে প্রাচীনতম রাজ্য হিসেবে বঙ্গ এর উল্লেখ আছে। এখানে আদিবাসী হিসেবে মগদের কথা বর্ণিত হয়েছে। বৌধায়ন ধর্মসূত্র-এ আর্যসভ্যতা বহির্ভূত এবং কলিঙ্গদের প্রতিবেশী হিসেবে বঙ্গ-এর উল্লেখ করা হয়েছে। পুরানে প্রাচ্যদেশের তালিকায় বঙ্গের উল্লেখ রয়েছে। ‘রামায়ণে অযোদ্ধার সঙ্গে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ বলে বঙ্গদের উল্লেখ করা হয়েছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বঙ্গের শ্বেত-স্নিগ্ধ বস্ত্রের উল্লেখ আছে। মহাভারতের দিগ্বিজয় অংশে ভীমের পুণ্ড্র থেকে বঙ্গদের আক্রমণের কথা রয়েছে। উল্লেখ থেকে মনে হয়, বঙ্গ ছিল পূর্বাঞ্চলীয় সুপরিচিত একটি দেশ (রহিম ও অন্যান্য,২০০৬: ২৭)। এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক আবুল ফজলের সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি

'মনে করেন, 'বাঙ্গালার আদি নাম ছিল বঙ্গ। প্রাচীনকালের এখানকার রাজারা ১০ গজ উঁচু ও ২০ গজ বিস্তৃত প্রকান্ড আল নির্মাণ করতেন; এ থেকেই বাঙ্গাল বা বঙ্গালাহ নামের উৎপত্তি। রমেশচন্দ্র মজুমদার এই ব্যাখ্যা মেনে নেননি। তবে নীহাররঞ্জন রায় আবুল ফজলের অন্বেষা মেনে নিয়েছেন (রহিম ও অন্যান্য,২০০৬: ১৯)। প্রাচীন কালে বঙ্গ নামের যে ব্যবহার ছিল তাতে কারো সন্দেহ নেই। প্রাচীনকালের এই বঙ্গ শব্দটি সুলতানী আমলে আরও পরিপুষ্ট হয়েছে। সুলতান শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহের নাম এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁর আমল থেকেই বঙ্গ শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হতে থাকে বাঙ্গালাহ শব্দ। 'মিনহাজের পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক জিয়া-উদ্দীন- বারণী সর্বপ্রথম বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু সমগ্র দেশ নয়, এর অংশ বিশেষের উল্লেখ প্রসঙ্গে। পরবর্তী ঐতিহাসিক শামস-ই- সিরাজ আফিফ সুলতান শামস- উদ্দ- দীন ইলিয়াস শাহকে শাহ-ই বাঙ্গালা, শাহ-ই-বাঙ্গালিয়ান বা সুলতান-ই-বাঙ্গালা রূপে আখ্যা দিয়েছেন (রহিম ও অন্যান্য, ২০০৬:১৯)। সুলতান ইলিয়াস শাহ সমস্ত বাংলায় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁর পূর্বে অন্য কোন মুসলমান শাসক এভাবে দীর্ঘকাল বালায় শাসন করতে পারেননি। 'ইলিয়াস শাহ বাংলার তিনটি শাসনকেন্দ্রেই (লখনৌতি, সাতগাঁও ও সোনারগাঁও) নিজ আধিপত্য বিস্তার করেন এবং বাংলায় স্বাধীন সুলতানের প্রকৃত ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এই স্বাধীনতা প্রায় দু'শো বছর ধরে অক্ষুণ্ন ছিল। তাই ইলিয়াস শাহ মুসলমান সুলতানের মধ্যে প্রকৃত অর্থেই প্রথম শাহ-ই বাঙ্গালা বা সুলতান-ই বাঙ্গালা' (পূর্বোক্ত,পৃ.১৯)। মোগল আমলে বাঙ্গালার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় সুবা বাঙ্গালাহ। 'আবুল ফজল এই প্রদেশের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে, বাঙ্গালা পূর্ব-পশ্চিমে অর্থাৎ চট্টগ্রমা থেকে তেলিয়াগড় পর্যন্ত ৪০০ ক্রোশ এবং উত্তর-দক্ষিণে, অর্থাৎ উত্তরে পর্বতমালা হতে দক্ষিণে হুগলি জেলার মন্দারণ পর্যন্ত ২০০ ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। এর পশ্চিমে সুবা বিহার। কামরূপ ও আসাম সুবা বাঙ্গালার সীমান্তে অবস্থিত ছিল (পূর্বোক্ত, পৃ.১৮)। এরপর এ অঞ্চলে ইউরোপীয়দের আগমন ভাষা ও সংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। ইউরোপীয়দের মধ্যে এ অঞ্চলে প্রথমে আসেন পর্তুগীজরা। ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত পর্তুগীজ জাতি বাংলাদেশে ব্যবসা বাণিজ্য, কৃষিকাজ প্রভৃতি কাজে লিপ্ত হয়। প্রায় এক শতাব্দী বাংলাদেশে পর্তুগীজদের উপস্থিতি এ দেশের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে মিশে আছে (আসাদুজ্জামান, ২০১৩:২৩২-২৩৩)। ১৫১৪ পর্তুগীজ ভার্থেমা, বারবোসা বা জোয়াও দ্য ব্যারোসের বর্ণনায় বেঙ্গালা রাজ্য ও বেঙ্গালা শহরের উল্লেখ রয়েছে। এরপর বেঙ্গালা শহরের উল্লেখ করেছেন- গ্যাস্টলদি (১৫৬১) তাঁর মানচিত্রে চাঁটিগ্রামের পশ্চিমে 'বেঙ্গালার' অবস্থিতি দেখিয়েছেন। সীজার ফ্রেডারিক (১৫৬৩-১৫৮১) বেঙ্গালা রাজ্যেও অন্তর্গত চাটিগানের ১২০ মাইল দূরে অবস্থিত সোন্দিব দ্বীপের উল্লেখ করেছেন। পর্তুগীজরা বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ চর্চায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। তার পরিচয় পাওয়া যায় পর্তুগীজ পাদ্রি মনোএল দ্য আসসুঁম্পসাউ রচিত বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচনার মধ্য দিয়ে। তিনি বাংলাভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন ভোকাবুলারিও এম ইদিওমা বেঙ্গলা ই পর্তুগীজ নামে ১৭৩৪ সালে। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৭৪৩ পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পর্তুগীজরা বাংলা শব্দটি ব্যবহার করেছেন বেঙ্গলা নামে। ইংরেজরা পর্তুগীজদের বেঙ্গলা, ব্যবহার করেন বেঙ্গল বা বেঙ্গলি (Bengal or Bengalee or Bengali) হিসেবে। তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ১৭৭৮ সালে রচিত ইংরেজদের মধ্যে প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচয়িতা নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেডের রচনায়। তাঁর ব্যাকরণের নাম 'A Grmmar of the Bengalee Language' অথবা ১৮০১ সালে রচিত উইলিয়াম কেরি রচিত 'A Grammar of the Bengali Language'. এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, আফীফ বাঙ্গালা বলতে সারা বাংলাকে অর্থাৎ আবুল ফজলের বাঙ্গালা বা ইউরোপীয়দের বেঙ্গালা, বেঙ্গলকে বুঝিয়েছেন। তাই ইলিয়াস শাহের সময় থেকেই

বাঙ্গালা প্রথম ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর আগে এমনকি মুসলমান-পূর্ব যুগে, এই ব্যাপক অর্থে বাংলা বা বাঙ্গালার ব্যবহার পাওয়া যায় না। ঐ সময়ে বঙ্গ বা বঙ্গাল দ্বারা বাংলার অংশবিশেষকে নির্দেশ করা হতো। 'তাই বাঙ্গালা নামের প্রচলন ইলিয়াস শাহের সময় থেকেই শুরু হয়েছে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। সুকুমার সেন বঙ্গ থেকে বাঙ্গালা বা বাঙ্গালাহর উৎপত্তি হয়েছে, বাঙ্গালা নামটি মুসলমান অধিকারকালে সৃষ্ট এবং ফারসি বাঙ্গালাহ থেকে পর্তুগীজ বেঙ্গালা ও ইংরেজি বেঙ্গল এসেছে বলে মত প্রকাশ করেন (আবদুর রহিম ও অন্যান্য, ২০০৬:২০)। বাংলা বা বাঙ্গালার ১৯৪৭ সালের পর পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা নামে আলাদা প্রদেশ গঠিত হলে বাংলা নামের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম দেশ আত্মপ্রকাশ করলে বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশ শব্দের ব্যবহারে গতিশীলতা পরিলক্ষিত হয়।

প্রাক-আর্যযুগে ভারতবর্ষে যে সংস্কৃতি প্রচলিত ছিল বর্তমান বাংলাদেশেও এর প্রভাব সুস্পষ্ট। অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোকদের সংস্কৃতির বৃহৎ অংশ লক্ষ্য করা যায় বাঙ্গালি সংস্কৃতির মধ্যে। বস্তুগত ও অবস্তুগত সংস্কৃতির নানা উপাদান এসব সংস্কৃতির সঙ্গে একীভূত হয়ে এক মিশ্রিত সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে নিচের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য-

> মৃত্যু-উত্তর জীবনে বিশ্বাস, পিতৃপুরুষগণের পূজা, কৃষি সম্পর্কিত বিভিন্ন উৎসব যথা পৌষ-পার্বণ, নবান্ন প্রভৃতি, মেয়েদের দ্বারা পালিত হরেক রকম ব্রত, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে চাল, দুর্বা, কলা, পান, সুপারি, নারিকেল, সিঁদুর, কলাগাছ, ইত্যাদির ব্যবহার, শিলা, বৃক্ষ ও লিঙ্গ পূজা, পূজায় ঘটের ব্যবহার ইত্যাদি বাঙ্গালি ও অবাঙ্গালি সংস্কৃতিতে লক্ষ্য করা যায় (সুর, ১৯৯২:২৬)।

চড়ক, গাজন প্রভৃতি উৎসবও বাঙলাদেশের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। এ থেকে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে,বাঙালীর এই সকল বৈশিষ্ট্য প্রাক-আর্য যুগ থেকে প্রচলিত আছে। যোগ অভ্যাসও বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। লিঙ্গরূপী শিবপূজা, মাতৃদেবের পূজা প্রভৃতি বাঙলা দেশেই প্রাক-আর্যকাল থেকে চলে এসেছে। তন্ত্রধর্মের উদ্ভবও বাঙলা দেশেই হয়েছিল। 'বাঙালী সংস্কৃতির আরও অনেক বৈশিষ্ট্যের কথা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন, যেমন-হস্তবিদ্যা, রেশমবয়ন, সাংখ্যদর্শন, প্রেক্ষাগৃহ (বা রঙ্গালয়), নৌকা ও জাহাজ নির্মাণ প্রভৃতি। এসব বাঙালী সংস্কৃতির অবদান। সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উলুধ্বনি দেওয়া, আলপনা অঙ্কন, কাঁথা সেলাই করা, বড়ি দেওয়া প্রভৃতিও বাঙালী সংস্কৃতির নিজস্ব অবদান' (সুর, ১৯৯২:২৬)। '১৯৯১ সালের লোক গণনায় বাংলাদেশে ২৯ টি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় (ট্রাইবাল পপুলেশন) এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনসংখ্যা দেখানো হয়েছে ১২,০৫,৯৭৮ জন' (দ্রং ও ত্রিপুরা, ২০০৪:৭)। কিন্তু উপর্যুক্ত 'সরকারি লোকগণনায় অনেক জাতিসত্তার নাম উল্লেখ করা হয়নি এবং কিছু কিছু জাতির নাম দু'বারও লেখা হয়েছে (দ্রং ও ত্রিপুরা, ২০০৪:৭)। তবে বাংলাদেশের আদিবাসী ফোরাম কর্তৃক লিখিত ও সম্পাদিত বিভিন্ন প্রকাশনায় বাংলাদেশে ৪৫টি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী বসবাস করে এমন তথ্য পাওয়া যায় এবং আদিবাসী ফোরাম ও অন্যান্য আদিবাসী সংগঠন দাবি করে যে, তাদের প্রকৃত জনসংখ্যা বর্তমানে প্রায় ২০ লক্ষ্য ছাড়িয়ে গেছে (হাসান ও অন্যান্য, ২০১১:২০)। আদিবাসী ফোরামের তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহ হচ্ছে ঃ

'আসাম (অহমিয়া), ওঁরাও, কোচ, কোল, কর্মকার, ক্ষত্রীয়, বর্মন, খাসি, খারিয়া, খিয়াং,খুমি,খণ্ড, গারো, গুরখা, গণ্ড, চাকমা, চাক, তুরি, তঞ্চঙ্গাঁ, ত্রিপুরা, ডালু, পাংখো, পাহাড়িয়া, পাহান, পাত্র, বম, বানাই,

বিদিয়া, বাগদি, মারমা, ম্রো, মণিপুরি, মাহাতো, মুণ্ডা, মালো, মাহালি, মুরিয়ার, মসহর, রাখাইন, রাই, রাজবংশী, রাজোয়াড়, লুসাই, সাঁওতাল, সিং ও হাজং' (উল্লেখ, হাসান ও অন্যান্য, ২০১১:২১)। এদের মধ্যে অঞ্চলভিত্তিক সংখ্যাগরিষ্ঠ নৃগোষ্ঠী হচ্ছেঃ

ক্রমিক নং	**অঞ্চল**	**সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়**
১.	পার্বত্য চট্টগ্রাম	চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গাঁ, বম, চাক, ম্রো, পাংখো, লুসাই এবং খিয়াং
	রাজশাহী-দিনাজপুর	সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, মাহাতো, পাহাড়িয়া এবং মালো
	ময়মনসিংহ	গারো, হাজং, কোচ, বানাই, রাজবংশী, ডালু এবং বর্মন।
	সিলেট	মণিপুরী, খাসিয়া, পাত্র এবং গারো।
	পটুয়াখালী-কক্সবাজার	রাখাইন। [উৎসঃ সংহতি,২০০৩:৭৯]

প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্রের অভাব বলে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বাংলার অতীত ইতিহাস অন্বেষণে তাই আমাদেরকে ভাষাতত্ত্বের আশ্রয় নিতে হয়। 'ভাষাতত্ত্বের বিচারে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে, বাংলাদেশে আর্যভাষা আগমনের পূর্বে এ দেশের লোকেরা কোল বা অস্ট্রিক জাতীয় ভাষা এবং কতকটা দ্রাবিড় ভাষা ব্যবহার করত (মন্তাজ, ২০১৪: ৩১)। 'বাংলাদেশে বসবাসরত ক্ষুদ্রজাতিগুলোকে নৃবিজ্ঞানীরা ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে ৬টি ভাগে ভাগ করেছেন। যথাঃ

ক. টিবেটো-বার্মনঃ

১. কুকি-চীনাঃ এ ভাষাভাষীরা বাস করে পার্বত্য চট্টগ্রামে আর ভাষাগত দিক থেকে তাদের নিকটতম যোগ ব্রহ্মদেশে প্রচলিত ভাষার সঙ্গে।

২. বরোঃ বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব কোণের গারো এবং কাছাড়ি ত্রিপুরাদের মধ্যে এ ভাষা প্রচলিত।

খ. অস্ট্রো-এশিয়াটিক অথবা মনখোমের।

৩. খাসি ভাষাঃ এদের বাস বাংলাদেশের সিলেট জেলায় আর ভারতীয় অঙ্গরাজ্য মেঘালয়ে।

৪. মুণ্ডাঃ মধ্য পূর্ব ভারতে মুণ্ডা ভাষাভাষী লোকের সংখ্যা প্রায় এক কোটির মতো। বিগত শতাব্দীতে তাদের কেউ কেউ বর্তমান বাংলাদেশে এসে বসবাস স্থাপন করেছিল।

গ. দ্রাবিড়ঃ

৫. দক্ষিণ ভারতের চারটি রাজ্যে এবং মধ্যভারতের কোন কোন ক্ষুদ্র জাতির মধ্যে এই দ্রাবিড় ভাষা প্রচলিত। জনসংখ্যার দিক দিয়ে প্রায় ষোল কোটি লোক দ্রাবিড় ভাষাভাষী। গত শতাব্দীতে এই দ্রাবিড় ভাষাভাষীর কিছু লোকও বর্তমান বাংলাদেশে বসবাস করেছিল।

ঘ. ভারতীয় আর্যঃ

৬. বর্তমান বাংলাদেশে প্রচলিত বাংলা ভাষার উপভাষাগুলো এবং বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা এই ভারতীয় আর্য ভাষাভাষী (মন্তাজ, ২০১৪:৩৪)।

পাত্র জনগোষ্ঠীর ইতিহাস

পাত্র জনগোষ্ঠী সিলেট জেলার সদর উপজেলার খাদিমনগর এলাকায় বাস করে। সিলেটে ইসলাম প্রচারের পূর্বেই তারা এ অঞ্চলে বাস করতো বলে বিভিন্ন তথ্যে উল্লেখ আছে। হজরত শাহজালালের সঙ্গে তাদের রাজা গৌড়গোবিন্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিংবদন্তি আছে যে, গৌড় রাজ্যের টুলকিটুকর মহল্লার একজন অপুত্রক মুসলমান পুত্র সন্তান কামনায় গরু শিরনি 'মানত' করেন। যথারীতি তার সে মনবাসনা পূর্ণ হলে তিনি সে শিরনি আদায় করেন গরু জবাই করে; যা ছিল পাত্রদের নিকট দেবতুল্য। দুর্ঘটনাবশত একটি কাক গোমাংশের একখণ্ড গৌড়গোবিন্দ রাজার পূজামণ্ডপের আঙিনায় ফেললে ক্রোধান্বিত রাজা দোষীকে খুঁজে বের করেন এবং নবজাতকের হাত কেটে ফেলেন। বিপন্ন বুরহান উদ্দীন দিল্লীর দরবারে বিচার প্রার্থী হলে দিল্লীর সম্রাট রাজা গৌড়গোন্দিকে শায়েস্তা করার নিমিত্তে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু মায়া বলে বলিয়ান গৌড় গোবিন্দের সাথে যুদ্ধে দিল্লী সম্রাটের বাহিনী পরাজিত হয়। এ সময় ইয়েমেন দেশ থেকে ইসলাম প্রচারার্থে আগত একজন সুফি দরবেশ হজরত শাহজালাল দিল্লীতে অবস্থান করছিলেন। তিনি বোরহান উদ্দীনের করুণ কাহিনী শ্রবণে সহানুভূতিবশত ৩৬০ জন অনুগামী দরবেশসহ সিলেট নগরীর প্রান্তে সুরমা নদীর তীরে এসে উপস্থিত হন। দরবেশের আগমনে ভীত সন্তস্ত্র গৌরগোবিন্দ সুরমা নদী থেকে সব নৌযান সরিয়ে ফেলেন। কিন্তু আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন দরবেশ একখণ্ড গোচর্মনির্মিত জায়নামায নদীর পানিতে বিছিয়ে অনুগামী দরবেশগণসহ অলৌকিকভাবে নদী পাড়ি দেন। দরবেশের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দর্শনে ভীত গৌড়গোবিন্দ রাজবাড়িতে আত্মগোপন করেন। যথারীতি রাজবাড়ির নিকটবর্তী একটি উঁচু টিলায় দাঁড়িয়ে আযানের ধ্বনি উচ্চারণ করলে বিশিষ্ট রাজালয় ভেঙ্গে পড়তে থাকে। এরূপ অলৌকিক কাজে রাজা গৌরগোবিন্দ ভীত হয়ে নগরী থেকে খানিক দূরে অরণ্যে পলায়ন করেন। তার স্বজাতি পাত্ররা তাকে অনুসরণ করে অরণ্যের দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু প্রাণভয়ে রাজা গৌড়গোবিন্দ তখন বনের গভীরে চলে যায়। নিশ্চিদ্র ঘন অরণ্যের গাছ বাঁশ বিশেষত রামকলার গাছ ইত্যাদি কেটে কেটে রাজা তার পলায়নের পথ বের করেন। অনুগামী পাত্ররা সে পথ অনুসরণ করে নৃপতির সন্ধান চালায়। কিন্তু পাত্ররা রাজাকে না পেয়ে হতাশ হয়ে অনুসন্ধানে বিরত হয়। প্রাণভয়ে ভীত পাত্র সম্প্রদায় উক্ত অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে যা পরবর্তী যুগে তাদের বাসস্থান হিসেবে গড়ে ওঠে।

উইলিয়াম হান্টার প্রমুখ ইংরেজ ঐতিহাসিকের মতানুযায়ী ১৩৮৫ সালে হযরত শাহজালাল সিলেট বিজয় করেন। সে সময় দিল্লীর সম্রাট ছিলেন ফিরোজশাহ তুঘলক। ফিরোজশাহ তুঘলকের রাজত্বকাল ১৩৫১ থেকে ১৩৮৮ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উল্লেখ্য যে, ফিরোজশাহ তুঘলক সিলেট অভিযানে প্রথমত সেনাপতি সিকান্দর শাহকে সসৈন্যে প্রেরণ করেন; কিন্তু তিনি সিলেট বিজয়ে ব্যর্থ হন। পরবর্তীকালে আবার প্রেরিত হন সিপাহশালার সৈয়দ নাসির উদ্দিন। 'তারিখ ফিরোজশাহী' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, এক হাজার অশ্বারোহী ও তিনহাজার পদাতিক সৈন্য নিয়ে সৈয়দ নাসির উদ্দিন সিলেটের পথে রওনা হন। হজরত শাহজালাল তাঁর দরবেশ বাহিনীসহ সৈয়দ নাসির উদ্দিনের সৈন্যবাহিনীর সাথে সম্মিলিত হন। ইতিহাস থেকে জানা যায়, সুলতান ফিরোজশাহের শাসনকালে ১৩০৩ শতাব্দীতে দরবেশ হযরত শাহজালাল ও তাঁর অনুসারীগণের কাছে গৌর রাজ্যের পতন হলে পাত্র আদিবাসীদের একটি অংশ রাজা গৌড় গোবিন্দকে অনুসরণ করে পার্শ্ববর্তী ভারতে চলে যান এবং কিছু অংশ তৎকালীন সিলেট নগরীর উত্তর পূর্ব দিকে গহীন বনভূমিতে আশ্রয় নেন। এভাবে সিলেটে ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটে। এ প্রসঙ্গে নিচের উদ্ধৃতি গুরুত্বপূর্ণ-

> Many historians think that Sylhet or Sreehatta (enriched market place) was an expanded commercial centre from the ancient period. A large number of Bengalis

> migrated to sylhet. In the 14^{th} century, Muslim saint from Yemen Hazrat Shah Jalal (R) triumphed Sylhet and preach islam' (Population and Housining cencus, 2011: x).

এভাবে সিলেটে মুসলমান বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতির নতুন ধারা শুরু হয়। পূর্বের একচ্ছত্র হিন্দু সংস্কৃতির বিকাশের স্থান দখল করে মুসলমান সংস্কৃতি। 'মুসলমান রাজশক্তির বিজয়ালাভে হিন্দু শাসকশ্রেণি যে দেড় শত দুই শত বৎসরের মত (খ্রিঃ ১২০০-খ্রিঃ ১৪০০) মুহ্যমান হইয়া যায় তাহাতে সন্দেহ নাই' (হালদার, ২০০৮: ১৭৫)। এই পটভূমিতে সিলেট অঞ্চলে ইসলামের আবির্ভাব একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ইসলাম এখানে একটি শক্তিশালী সামাজিক-সাংস্কৃতিক ধারা হিসেবে গড়ে ওঠে (চন্দ, ২০০৬)। এছাড়া এখানে এমন এক ধরনের জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল 'যাঁরা দীর্ঘদিন যাবত বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সংমিশ্রিত আচার-প্রথার মধ্যে জীবন-যাপন করতেন এবং দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যারা গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার ঘটনাকে সহজে মেনে নেননি' (চৌধুরী, ১৯৯৯: ৫২২-২৩)।

লালেং থেকে কীভাবে তারা পাত্র নামধারণ করল তার একটি বিশদ বিবরণ আছে ম্রি। (২০০৭)-এর নিম্নোক্ত উক্তিতে–

> লালেং লোকেরা কিভাবে পাত্র হলো সে সম্পর্কে লক্ষণ লাল পাত্র প্রচলিত কিংবদন্তির উল্লেখ করে বলেন যে, রাজা গৌড় গোবিন্দের সময় পাত্ররা লালেং হিসেবেই পরিচিত ছিল। শাহজালাল যখন এ দেশে ইসলাম প্রচার করার জন্য আসেন তখন রাজা গৌড়গোবিন্দের সাথে বিভিন্ন সময় যুদ্ধের পর এক সময় তারা দু'জনেই মুখোমুখি হন। এ সময় শাহজালাল রাজা গৌড়গোবিন্দের কাছে জানতে চান যে, তিনি (গৌড় গোবিন্দ) সিলেট ছেড়ে যাবেন, যুদ্ধ করে না অন্য কোন শর্তে। রাজা তখন উত্তরে বলেন যে, তিনি শর্ত সাপেক্ষেই সিলেট ছেড়ে যাবেন। রাজা গৌড়গোবিন্দ ছিলেন যাদুবিদ্যায় পারদর্শী। তার ধারণা ছিল যে, তার যাদু শক্তি দিয়ে তিনি শাহজালাল এর আধ্যাত্মিক শক্তিকে পরাভূত করতে পারবেন। তাই তিনি আধ্যাত্মিক শক্তির সাথে তার যাদুকরি শক্তির প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েন। অন্যদিকে কথা ছিল যে, তিনি শর্ত সাপেক্ষে সিলেট ছেড়ে চলে যাবেন। তার শর্তের মধ্যে ছিল, আরবরা তাদের তীর দিয়ে রাজার লোহার ঘণ্টা ভাঙতে পারলে এবং তাদের আযান দিয়ে তাঁর দেবমন্দির ভাঙতে পারলে তিনি বিনা বাক্যে তাঁর রাজ্য সিলেট ছেড়ে চলে যাবেন। যাদুকরি শক্তির প্রতিযোগিতায় গৌড়গোবিন্দ পরাজিত হন। অপরপক্ষে আরবদের তীরের আঘাতে রাজার ঘণ্টা এবং তাদের আযানের প্রভাবে মন্দির ভেঙ্গে যায়। তাই শর্তানুযায়ী তিনি সিলেট ছেড়ে অজানা দেশে চলে যান। যাওয়ার সময় তিনি তার লোকদেরকে তার সাথে সিলেট ছেড়ে যেতে আহবান করেছিলেন। কিন্তু তিনি কখন এবং কোথায় চলে যাবেন সে সম্পর্কে কিছু বলেননি। তাই প্রজারা তাঁর পলায়নের সময় তাঁকে অনুসরণ করতে পারেননি। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও যখন তারা তাঁর আর সন্ধান পেলেন না তখন তারা আরও ভীত হয়ে পড়েন এবং এবং মুসলমানদের ভয়ে তারা পাহাড়ে পালিয়ে গেলেন। সেখানে তারা পাহাড়ের গুহায় বা পাথরের আড়ালে মুসলমানদের দৃষ্টি এড়িয়ে দীর্ঘদিন বসবাস করতে থাকেন। এভাবে তারা প্রায় দেড়শ থেকে দু'শ বছর ধরে পাহাড়ে লুকিয়ে থাকার পর তাদের পরবর্তী বংশধরেরা সমতল ভুমিতে বেরিয়ে আসতে থাকেন। এ সময় তাদের কয়েকজন বাঙালির সাথে দেখা হলে তারা নিজেদেরকে 'লালেং' বলে পরিচয় না দিয়ে নিজেদেরকে 'পাথর' সম্প্রদায় বলে পরিচয় দেন। কারণ তাদের সত্যিকার পরিচয় দিতে ভয় ছিল। সরকারি নথিপত্রেও তাদেরকে 'পাথর'

সম্প্রদায় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। 'পরবর্তী সময়ে সিলেটে রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপিত হলে পাত্ররা সনাতন ধর্মে দীক্ষিত হন। তখন রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন প্রধান অধ্যক্ষ পদ্ম মহারাজ তাদেরকে পাথর থেকে পাত্র নামে আখ্যায়িত করেন। এভাবেই পাত্ররা লালেং থেকে পাথর এবং তারপর পাত্র হিসেবে সবার কাছে পরিচিত হয়ে আসছেন (দ্রি. ৪৩১)।

পাত্রদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

পাত্রদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় দিতে গিয়ে চক্রবর্ত্তী (২০০০) লিখেছেন:

> আদিবাসী পাত্র কারা? -এ প্রশ্নটির কোন যথার্থ উত্তর পাওয়া যায়নি। আদিবাসী পাত্র সম্প্রদায়ের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের জন্য কোন জরিপকার্য পরিচালিত হয়নি। ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত Edward Dalton এর 'Tribal History of Eastern India' বা পরবর্তীকালে 'Ethnographic Survey of India'- তে পাত্র সম্প্রদায়ের কোন উল্লেখ নেই। অনুরূপভাবে ১৮৮৩ সালে প্রকাশিত James Wise এর Notes on the Races, Castes, and Tribes on Eastern India (vol.1-2) গ্রন্থেও পাত্র সম্প্রদায় অনুল্লেখ। H.H Risely প্রণীত 'Castes and Tribes' গ্রন্থে পাত্র সম্প্রদায়ের সামান্য উল্লেখ থাকলেও সেখানে তাদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় নেই। কেবলমাত্র ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত R.M Nathএর 'Background of Assamese culture' গ্রন্থে আদিবাসী পাত্রদের চুটিয়া হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর ফলে আদিবাসী হিসেবে পাত্র সম্প্রদায়ের একটা পরিচয় দেয়ার চেষ্টা করা হলেও তাদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় অজানার অন্ধকার বিবরে রয়ে গেছে। পাত্রদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় মিশ্রিত বলে মনে হয়। তাদের একাংশের মধ্যে মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু অন্য অংশে বিভিন্ন জাতিগত বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্যণীয়। তাদের দেহের গড়ন বিভিন্ন, গায়ের রং বিভিন্ন, তারা খাসিয়াদের মতো শক্ত গড়নের অধিকারী নয়। এক কথায় বলা যেতে পারে যে, তাদের দৈহিক গড়ন ও বৈশিষ্ট্য বাঙালিদের মতো নয় (পৃ.২৮-২৯)।

বাঙলার আদিম অধিবাসীরা ছিলেন অস্ট্রিক (মুণ্ডারী) ভাষা গোষ্ঠির লোক। নৃতত্ত্বের ভাষায় এদের প্রাক-দ্রাবিড় বা 'আদি অস্ত্রাল' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সাহিত্যে এদেরকে 'নিষাদ' বলা হয় (সুর, ১৯৯০)। বাঙলার আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল, কোরা, লোধা প্রভৃতি উপজাতিসমূহ এই গোষ্ঠিভুক্ত। এছাড়া, হিন্দু সমাজের 'অন্ত্যজ জাতিসমূহও এই গোষ্ঠীরই বংশধর। উল্লেখ্য যে, সিলেটে বসবাসরত উপজাতিদের পূর্ব পুরুষেরা এ অঞ্চলে এসেছিল উত্তর-পূর্ব দিক থেকে এবং তাদের শরীরে প্রধানত মঙ্গোলীয়ান রক্তের ধারা প্রবাহমান' (মোহান্ত, ১৯৯৯: ৬৬৭)। সিলেটের ক্রমক্ষয়িষ্ণু পাত্র সম্প্রদায়ও এই গোষ্ঠিভুক্ত। তাঁদের মধ্যে মঙ্গোলয়েড ও অন্যান্য জাতির মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়।

পাত্র সম্প্রদায়ের সঠিক নৃতাত্ত্বিক পরিচয় জানা যায়নি বলে তাঁদের জাতিসত্তার পরিচয় সংকট (identity crisis) রয়েছে। তাঁরা কখনও কখনও 'পাতর', আবার কখনও 'পাথর' হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে। সম্ভবত অঙ্গারিক কয়লা উৎপাদন করত বলে তাঁদেরকে বলা হত 'পাথর' যা পরবর্তীকালে অপভ্রংশে রূপান্তরিত হয়ে 'পাতরে' রূপ নিয়েছে। অবশ্য তাঁরা নিজেদেরকে লালেং বা লালং বলে অভিহিত করে থাকেন। এই লালেং বা লালং শব্দের অর্থ হলো পাত্র। সিলেটে স্থানীয়ভাবে জমির দলিলপত্রে তাঁদের 'পাথর' বা খাসিয়া হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু পাত্রদেরকে খাসিয়া হিসেবে উল্লেখ করার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নেই। কেননা খাসিয়াদের সঙ্গে পাত্রদের নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক কোন সাদৃশ্য নেই। কাজেই পাত্রদেরকে নিজস্ব পরিচয়েই উল্লেখ করা উচিত।

উপসংহার

বাঙ্গালির নৃতত্ত্ব গঠনে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভূমিকা অনন্য বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। অতি প্রাচীন কাল থেকেই নানা জাতির মিশ্রণে বাংলা সংস্কৃতি আজ বর্তমান পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। বাংলা সংস্কৃতির চর্চা আজ অতীতের তুলনায় অনেক প্রসারিত ও ব্যাপৃত। নানা ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠীর মিলনমেলায় বাঙ্গালি সংস্কৃতির যে মিশ্রিত রূপ বর্তমানে আশ্রিত তা কোন ভাবেই উপেক্ষণীয় নয়। বরং বাঙ্গালি সংস্কতিকে তা আরও সমৃদ্ধ করে তুলেছে। প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত বাঙ্গালির অনেক কিছুই অতীত সংস্কৃতি থেকে আহরিত। বাংলাদেশের মূল ধারার জনগণের সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সমবায়ে বাঙ্গালি সংস্কৃতি নব রূপে রূপায়িত। অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর ন্যায় সিলেটের পাত্র সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি বাংলার সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলার নৃতত্ত্ব গঠনে এ-ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভূমিকা তাই অবশ্যই স্বীকার্য।

গ্রন্থপঞ্জি

আকসাদুল আলম (২০০৭)। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ভিত ভৌগোলিক অবস্থান ও তার প্রভাব। (সম্পা.) কে এম মোহসীন ও অন্যান্য। *সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

আসাদুজ্জামান মুহাম্মদ (২০১৩)। বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ চর্চায় পর্তুগীজদের অবদান। (সম্পা.) মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়। *ইতিহাস অনুসন্ধান*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ।

রতনলাল চক্রবর্ত্তী (২০০০)। *সিলেটের নিঃস্ব আদিবাসী পাত্র*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স

মোমেন চৌধুরী (১৯৯৯)। *নজরুল সাহিত্যে প্রবাদ-প্রবচন-বাগধারা*। ঢাকা: নজরুল ইনস্টিটিউট

অনুরাধা চন্দ (২০০৬)। *সিলেট নগরীর পহেলা কেতাব ও দইখুরার রাগ*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং

দ্রং সঞ্জীব ও ত্রিপুরা মথুরা। (২০০৪)। *শিক্ষা চিত্র: প্রাথমিক বাংলাদেশের আদিবাসী* (সম্পাদিত), ঢাকা: বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম

সাহেদ মন্তাজ (২০১৪)। *বাংলাদেশের আদিবাসী পূর্বাপর*। ঢাকা: দি স্কাই পাবলিশার্স

রসময় মোহান্ত (১৯৯৮)। সিলেট অঞ্চলের আদিবাসী প্রেক্ষিত ও শব্দকর সমাজ সমীক্ষা। মৌলভী বাজার: আত্মউন্নয়ন সমিতি (আউস)

সেলেস্তিন শিশির প্রি (২০০৭)। পাত্র। (সম্পা.) মেসবাহ কামাল ও অন্যান্য, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, ৪৩১-৪৪০, ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি

মুহম্মদ আবদুর রহিম ড. ও অন্যান্য (২০০৬)। *বাংলাদেশের ইতিহাস*। ঢাকা: নওরোজকিতাবিস্তান।

আহমদ শরীফ (২০০১)। বাঙলা, বাঙালী ও বাঙালীত্ব। ঢাকা: অনন্যা

আহমদ শরীফ (২০০৪)। বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য। ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স

এ কে এম শাহনাওয়াজ (২০০৭)। *বাংলার সংস্কৃতি বাংলার সভ্যতা*। ঢাকা: দিব্য প্রকাশ

অতুল সুর (১৯৭৭)। *বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়*, কলিকাতা: জিজ্ঞাসা

অতুল সুর (১৯৯০)। বাঙলা ও বাঙালীর সমাজ ও সংস্কৃতি। কলিকাতা: জ্যোৎস্নালোক

শাহেদ হাসান ও অন্যান্য (২০১১)। *ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকায়ত জ্ঞান*। রাজশাহী: রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃ- গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমী

মোহাম্মদ মনযুর-উল হায়দার (২০০৮)। চাকমা নৃগোষ্ঠীর ভাষা: নৃবৈজ্ঞানিক ও ভাষাতাত্ত্বিক পর্যালোচনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৯০, ৬৭-৭৪

সৈয়দ আকরাম হোসেন (২০১৩)। বাঙলাদেশ। (সম্পা. মনসুর মুসা)। *বাঙলাদেশ*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী

Population and housing cencus (2011). Community Report: Sylhet, Bangladesh Bureau of Statistics: Statistics and Informatics ministry of planning